International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)
ISSN:2582-9810
Vol. 7 Issue 2, February - 2022

বাংলায় ফারসি চর্চা

Study of Parsian language in Bengal

Mohammad Nasim (1st *Author*)
Assistant Professor, Dept. of Islamic Studies
University of Chittagong
Chittagong, Bangladesh.
nasimchittagong@gmail.com.

Naima Sultana (2nd *Author*)
Researcher
University of Rajshahi
Rajshahi, Bangladesh.

Abstract:
The Parsian language and literature have been practiced in Bengal from ancient period. Because Parsian words are found in many ancient Bengali literature. After invasion of Bengal by Ikhtiar Uddin Mohammad Bakhtiar Khalji in 1204, Parsian became the official language of Bengal. Parsian language and literature used to teach in Madrasahs, Schools, Colleges and even universities also. Still some public universities have individual department of Parsian language and literature. The article will focus on origin and development of Parsian language and literature in the than Bengal.

Keywords: Parsian language, Bengal, Pre-British period, British period, Pakistan period, Madrasahs, Schools, Colleges, Universities, Post independence.

ভূমিকা:

ফারসি ভাষা ইন্দোইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটি অন্যতম শাখা। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ইরান ও বাংলা পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণেই ঐতিহাসিক বাংলা ভূখণ্ডের জনগণের ফারসি ভাষার সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে ইস্কান্দার বা সেকেন্দার শাহ (Alexander the Gread) (৩৫৬-৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব)যখন আরবেলার যুদ্ধে ইরানিদের পরাজিত করে পারস্যে গ্রীক সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আর্য-ইরানিদের এক বৃহদাংশ ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। তাদের মাতৃভাষা ফারসির সাথে এদেশের লোকজনের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার সাথে ফারসি ভাষা ও ইরানি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। ফলে ভারতের বিভিন্ন নৌবন্দর দিয়ে ইরানি বণিক, সৈন্যবাহিনী, সুফি-দরবেশ, রাজ-কর্মচারী ও শিল্পীদেরও বাংলায় আগমন ঘটে। এই ফারসি ভাষা বাংলায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল প্রায় ছয়শ বছর।[১] এ কারণেই মুদ্রার পৃষ্ঠে, মসজিদের গাত্রে, গৃহ নির্মাণ লিপিতে, শাহী ফরমানে, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানাভাবে ফারসি ভাষা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।[২] ১৮৩৮ সালে বাংলা ও বিহারের মানুষের জন্য প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ফারসি-আরবি শিক্ষা দেয়া হতো।[৩] মুসলমানদেরকে ধর্মীয় প্রয়োজনে কুরআন পাঠের জন্য আরবি ভাষা শিখতে হতো এবং সরকারী চাকুরীর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। আলেম ও পির-মাশায়েখগণ ধর্মীয় মাহফিলে ফারসি ও উর্দু কবিতা আবৃত্তি করতেন। ফারসি-আরবি শিক্ষিত লোকেরা ফারসি ভাষায় পরস্পরের

১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী) (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১।

২. ডক্টর এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৯০।

৩ M. A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* V-11 (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963), P. 245.

মাঝে চিঠি আদান প্রদান করতেন। চিকিৎসকগণ ফারসি ভাষায় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করতেন। বাংলা তথা উপমহাদেশে মুসলমানগণ ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করে তাঁদের জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আর এ ইতিহাসচর্চা হয় মূলত ফারসি ও আরবি ভাষায়।[৪] বাংলার ফারসি কবি ও ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু কাব্যগ্রন্থ, ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, ধর্মীয় পুস্তিকা ফারসি ভাষায় রচনা করেন। এভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বাংলার সাথে বিভিন্নভাবে মিশে যায় এবং ক্রমে ক্রমে তা স্বগৌরবে বিস্তার লাভ করে।

বাংলায় ফারসি চর্চার সূচনা ও বিকাশ:

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির (মৃত.১২০৬ খ্রি.) বাংলা বিজয়ের পর থেকেই ফারসি ভাষার প্রভাব এ অঞ্চলে বেশি পরিলক্ষিত হয়। মূলত বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যদিয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য এদেশের ভাষা ও জ্ঞান চর্চার ইতিহাসে অনন্য স্থান লাভ করে। বাংলার মুসলিম শাসকগণ রাজকার্য পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে অফিস-আদালতের ভাষা ছিল ফারসি।[৫] বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি (১২০৩-০৬) রংপুর শহর প্রতিষ্ঠা করতঃ সেখানে কয়েকটি মসজিদ, মাদরাসা নির্মান করে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ফারসি চর্চার পথকে সুগম করেন।[৬] এদেশে বহু ইরানি ধর্ম প্রচারক, সুফী, দরবেশ ও সওদাগর আগমন করেছিলেন। বাংলার মাদরাসা ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে তাঁরা মুসলমানদের সমাজ গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। তাঁরাই বাংলার মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ইরানিরা অভিজাত শাসকদেরকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে, শিল্পকলায়, শিক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুতীক্ষ্ম ও দুরদর্শি সম্পন্ন করে তোলেন।[৭] বাংলার প্রধান প্রধান নগরসমূহে যেমন গৌড়, ফিরোজাবাদ, সোনারগাঁ, মুর্শিদাবাদ, মহিসন্তোষ বা মহিসুন (রাজশাহী), নাগর, চাঁটগাঁ প্রভৃতি স্থানে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেগুলোতে ফারসি-আরবি উভয় ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ শিক্ষাদান করতেন। এসমস্ত প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া করতে আসত।[৮] এ সময়ে রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি এবং মাদরাসাগুলো ফারসি ও আরবি দু'টি শাখায় বিভক্ত ছিল।[৯]

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার (১২০১-০৩) পর আলী মর্দান খলজির শাসনামলে (১২০৯-১৬) সর্বপ্রথম ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থটি ভোজর নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রচিত অমৃতকূণ্ড শীর্ষক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ্ কাজি রোকনুদ্দীন অমৃতকুণ্ডকে ফারসিতে রূপান্তরিত করে বাহরুল হায়াত নামে অভিহিত করেন।[১০] খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রোকনুদ্দীন কায়কাউসের আমলে (১২৯১-১৩০১) বঙ্গদেশে ফারসি ভাষায় নাম-এ-হক নামক গ্রন্থ রচিত হয়। ফিকহ শাস্ত্রীয় এ গ্রন্থটি রচনা করেন বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববীদ শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ১৩০০ হি.)। তিনি বুখারা থেকে দিল্লিতে আগমন করেন এবং সোনারগাঁও এ একটি মাদরাসা ও খানকাহ স্থাপন করেন। এ গ্রন্থটি তিনি তাঁর মাদরাসায়

৪. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি,২০০৮), পৃ. ১৮-১৯।

৫. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী),পৃ. ১৭।

৬. *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*,৬ষ্ঠ খন্ড (ভাষা সাহিত্য),সম্পাদনা: আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭),পৃ. ৫৪১।

৭. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খন্ড, অনুবাদ: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১৭।

৮ *Social and Cultural History of Bengal*, V- 1, pp. 161-169.

৯. *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*,পৃ. ৪২১।

১০. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য (ঊনবিংশ শতাব্দী)*,পৃ. ১৮।

পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেন।[১১] সুলতানি আমলেও বাংলার রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম (১৩৮৯-১৪০৯) মহাকবি হাফিয সিরাজীর কাব্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। গিয়াসউদ্দীন আযম ফারসি কবিতার একটি শ্লোক রচনা করেন, কিন্তু পরবর্তী চরণের মিল করতে পারলেন না। তাই তিনি অনেক উপঢৌকনসহ একজন দূত হাফিযের নিকট পাঠিয়ে পরবর্তী চরণ পূরণ করার জন্য অনুরোধ জানান। বার্ধক্য ও পথের দূরত্বের কারণে কবি হাফিয বাংলায় আসতে পারেননি। তবে সুলতানের প্রেরিত চরণটির সাথে মিল করে পূর্ণ একটি গযল রচনা করে বাংলায় পাঠান।[১২] উক্ত গযলের দুটি চরণ হলো:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند *
زین قند فارسی که به بنگاله میرود
حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث الدین *
غافل مشو که کار تو از ناله میرود[১৩]

"হে হিন্দুস্তানের তোতা পক্ষিসকল,ইহার মিষ্টতা আস্বদন কর,পারস্যদেশ হতে বঙ্গদেশে মিষ্টান্ন প্রেরিত হচ্ছে। হাফেজ,তুমি গিয়াস উদ্দীনের রাজসভায় কবিতা প্রেরণ করতে বিরত থেকো না। কারণ,তোমার বিলাপ ধ্বনি তথায় পৌছলে আশা পূর্ণ হবে।[১৪]

বাংলায় সর্বপ্রথম ফারসি অভিধান রচিত হয় রুকনুদ্দীন বরবক শাহের আমলে (১৪৫৯-৭৪)। মাওলানা ইব্রাহীম ফারুকী সংকলিত ফরহাঙ্গে ইব্রাহীমী অভিধানটি ১৪৫৯ সালে রচিত হয়। এ অভিধানে ইব্রাহীম ফারুকী ফারসির বিভিন্ন পরিভাষা সমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বরচিত অনেক ফারসি কবিতা রচনা করেন।[১৫] হুসেনশাহি বংশের শাসনামলেও (১৪৯৩-১৫৩৮) কোর্টের ভাষা ছিল ফারসি। তাই আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে সোনারগাঁও ফারসি চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে।[১৬] তিনি ১৫০২ সালে গুরবা-এ-শহীদ নামক একটি উচ্চমানের মাদরাসা স্থাপন করেন। সেটি ফারসি ও আরবি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের আমলে নির্মিত বিভিন্ন স্মৃতিসৌধে ফারসি-আরবি চর্চার স্মৃতি আজও বহন করছে। মুঘল আমলেই বাংলায় ফারসিচর্চা অনেকটা পূর্ণাঙ্গ রুপ লাভ করে। মুঘল বাদশাহগণ শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগী হবার ফলে বিদেশ থেকে বঙ্গদেশে কবি-সাহিত্যিকগণের সমাগম হয়। সায়েফ খাঁ সুবাদারির সময় (১৬৩৯) পাকিস্তান থেকে মুনীর লাহোরী বাংলায় আগমন করেন। তিনি বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আবহাওয়া নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেন। শাহজাদা মুহাম্মদ শূজা বাহাদুরের সময়েও (১৬৩৯-১৬৪৭) ইরান ও ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে অনেক ফারসি কবি ও সাহিত্যিক বঙ্গদেশে আগমন করেন। যদুনাথ সরকারের ভাষায়:

" It used to be said in Aurangzib's court circle that Shuja had turned Shia. The accusation is not true; but like Akbar and Shah Jahan, this prince also could not help appreciating the highly cultured and intellectual society of the many able persian scholars and administrations whom he met with Bengal, and his friendly association with them had the natural effect of softening any sunni rigidty that he might have once possessed. The

১১. *বাংলা বিশ্বকোষ,* ৪র্থ খন্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬), পৃ. ৪৩৯।
১২. ড. কলীম সাহসারামী, *খেদমাত গুযারানে ফারসী দার বাংলাদেশ* (ঢাকা: রায়েযানি ফারহাঙ্গে জামহুরী ইসলামী ইরান,১৯৯৯),পৃ. ৪।
১৩. খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাযী, মুহাম্মদ কাযবীনী ও ড. কাসেম গনী সম্পা., *দীওয়ান* (তেহরান: কিতাব খানেয়ে মিল্লী ইরান,১৩৮৩ হি.),পৃ. ২২৫।
১৪. গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন,* অনুবাদ ও সম্পাদনা: শ্রীরামগুপ্ত (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ,২০০৫), পৃ. ৮৮।
১৫. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী),পৃ. ২৪।
১৬. *খেদমাত গুযারানে ফারসী দার বাংলাদেশ,পৃ.* ৬।

names of many of his officers in Bengal suggest that they were persians and shias." [১৭]

শাহজাদা শূজার শাসনামলে তাঁর ঘনিষ্ট সহচর ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মাসূম বিন হাসান বিন সালেহ ১৬৬০ সালে ফারসি ভাষায় তারীখ-এ-শাহ-শুজাই রচনা করেন। বংগীয় ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। মুর্শির্দাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যেগুলোর অধিকাংশই ছিল ফারসি ও আরবি শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্র। এগুলোর মধ্যে নবাব মুর্শিদ কুলীখান (১৭১৭-২৭ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত কাটরা মাদরাসা ও বর্ধমান জেলার বুহার মাদরাসা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৮] সুবাদার শূজাউদ্দীন খাঁ (১৭২৭-৩৯) ও আলীবর্দী খাঁর আমলে (১৭৪০-৫৬) মুর্শিদাবাদ, হুগলী, আজিমাবাদ ও ঢাকা ফারসি চর্চার গুরুত্বপূর্ণ প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানদের পাশাপাশি অনেক হিন্দুও ফারসিতে দক্ষতা লাভ করে সরকারি ও বেসরকারি বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন।[১৯] অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা কবি ও ঐতিহাসিক নওয়াব আলী ইব্রাহীম খাঁ খলিল (মৃ. ১৭৯৩) ফারসি ভাষার অনেকগুলো ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে গুলযার-এ-ইব্রাহীম, সুহুফ-এ-ইব্রাহীম, খুলাসাতুল কালাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সময় ঢাকায় শাহ নূরী (১০৭৮-১১৮৮ হিজরি) নামক একজন বড় আলেম ও আল্লাহর ওলির আবির্ভাব ঘটে। ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতার ফলে তিনি পির ও পিরের খলিফাদের জীবন চরিত্র ফারসিতে অত্যন্ত মাধুর্যপূর্ণ ভাষাশৈলি ব্যবহার করে 'কেবরিতে আহমর' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলাও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একজন একনিষ্ট সেবক ছিলেন।

১৭ Sir Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal,* V. II, (Dacca : Dacca University, 2006), p. 335

১৮ Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and his times* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963), p. 238.

১৯ *History of Bengal*, V. II, p. 410.

ব্রিটিশ রাজত্বকালে ফারসি চর্চা:

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলার হাতে মুসলিম শাসনের অবসান হলেও ফারসি চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়েনি। বরং ব্রিটিশ শাসনামলেও বঙ্গদেশে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি হবার কারণে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মাঝে এ ভাষার বহুল ব্যবহার চলত।[২০] এমনকি ফারসি শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মচারীদেরকে বিশেষ ভাতা প্রদান করতেন। ১৭৬৫ সালে কলকাতার বর্ধমান জেলার বুহারে একটি মাদরাসা ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই মাদরাসা ও গ্রন্থাগারটি ফারসি-আরবি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[২১]

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ফারসি ভাষার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা এলাকায় 'দেশীয় কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২২] ১৮০০ সালে কলকাতায়'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'স্থাপিত হয়। এ কলেজের অধীনে ফারসি ও উর্দু চর্চা বেড়ে যায় এবং অনেক ফারসি গ্রন্থ উর্দুতে অনুদিত হয়।[২৩] উর্দুরপ্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের এ পৃষ্ঠপোষকতার ফলে উর্দু সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধি পেলেও ফারসি সাহিত্যচর্চা শিথিল হয়ে পড়েনি। বরং উর্দু ও ফারসি এ দুটি সাহিত্যের মধ্যে একটি ছিল অপরটির পরিপূরক। যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিকগণ ফারসির সমাদর করতেন তাঁরা সরকারের সহযোগিতা ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফারসিচর্চা অব্যাহত রাখেন। অফিস-আদালতের বাইরে সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলেও বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফারসি-উর্দুর চর্চা ছিল বিস্তর। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা এবং

২০. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য,* পৃ. ৯০।

২১. শিবলী নু 'মানী, *মাকালাত-এ-শিবলী*, ৩য় খন্ড (আযমগড়, মা' আরিফ প্রেস ১৯৩২), পৃ. ১২২২।

২২. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য,*পৃ. ৬৭।

২৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পশ্চীম বংগে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪), পৃ. ৩।

অন্যান্য স্থানেও এ ভাষাদ্বয়ের প্রভূত চর্চা ছিল। এ সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত পণ্ডিত ফারসি চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা জেলায় নওয়াব আহসানুল্লাহ শাহীন (১৮৪৬-১৯০১ খ্রি.), আহমদ আলী আহমদ, উবায়দুল্লাহ উবায়দী সুহরাওয়ার্দী[২৪] (১৮৩২-১৮৮৫ খ্রি.), খান বাহাদুর আব্দুল করীম খাকী (১৮৭৩-১৯৪৫ খ্রি.); সিলেট জেলায় এলাহ বখত মজুমদার, সাঈদ বখত মজুমদার, হামীদ বখত মজুমদার; চট্টগ্রাম জেলায় খানবাহাদুর হামীদুল্লাহ হামীদ (১৮০৯-১৮৮০), সুফি ফতেহ আলী ওয়াইসী[২৫] (১৮২৩-১৮৮৬), মুফতী ফয়যুল্লাহ[২৬] (১৮৯২-১৯৭৬), ফরিদপুর জেলায় কাজী ফকির

২৪. সোহরাওয়ার্দী, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী:(১৮৩২-১৮৮৫) পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার চিতওয়া গ্রামে বিখ্যাত সোহরাওয়ার্দী পরিবারে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি স্বগৃহে আরবি ও ফারসি ভাষা শেখেন এবং ১৮৫৭ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ফাইনাল সেন্ট্রাল পরীক্ষা পাস করেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ইংরেজি ভাষাও রপ্ত করেন। ১৮৬৫ সালে হুগলি কলেজে অ্যাংলো-আরবির অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদরাসার প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু ওই পদে বহাল ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, যুক্তিবাদী, উদারপন্থি শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক। ফারসি ভাষায় তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ফারসি দিওয়ান (১৮৮৬), দস্তুর-ই-পার্সি আমুজ (ফারসি ব্যাকরণ), দস্তুর-ই-ফার্সি-আমুস (ফারসি, ছন্দ ও অলঙ্কার), দস্তান-ই-ইবরাতবার (ফারসি, আত্মজীবনী) ইত্যাদি। তাঁর গধযড়সবফধহ ঊফঁপধঃরড়হ রহ ইবহমধষ (১৮৬৭) শিক্ষাবিষয়ক একখানি মৌলিক গ্রন্থ। জ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে "বাহার-উল-উলম" (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "বাহার-উল-উলুম ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী" পদকটি আজও প্রচলিত আছে। তিনি ১৮৮৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যু বরণ করেন।

দেখুন:https://bn.banglapedia.org/index.php/সোহরাওয়ার্দী, ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী

২৫. ফতেহ আলী ওয়াইসী রাহ. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া থানার আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক সোবহান–হাজি পাড়া নামক গ্রামে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতা বালাকোট যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এর কয়েক মাস পরে তাঁহার মাতাও পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কোন বিষয় একবারের বেশি দ্বিতীয় বার পড়িবার প্রয়োজন হইত না। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনের ক্বারী হইয়াছিলেন। প্রথমে হুগলী শহরের হাজী মুহাম্মদ মহসিন মাদরাসায় পবিত্র কুরআনের তাফসীর, হাদীস শরীফ, ফেকাহ, অসুল, মান্তেক প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবী, উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দিওয়ানে ওয়াইসী' নামক অনন্য অসাধারণ ফারসী ভাষায় মহাকাব্য (কিতাব) রচনা করিয়া জগতের বুকে অমর হইয়া আছেন বিশ্ব বরেণ্য সুবিখ্যাত বাঙ্গালী ফার্সী মহাকবি হিসাবে। দিওয়ানে ওয়াইসী' কাব্য গ্রন্থে মোট ১৭৯টি গজল ও ২৩টি কাসিদা আছে। দিওয়ানে ওয়াইসীর পরবর্ত্তী বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩১ নিয়ে কলিকাতার পুস্তক প্রকাশক হাজী আবদুল কাইয়ুম দ্বারা কানপুর কাইয়ুমী প্রেস হইতে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। উক্ত কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হাজী আবদুল কাইয়ুম কর্তৃক উক্ত কানপুর কাইয়ুমী প্রেস হতে তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গানুবাদ সৈয়েদ নূরে আখতার হোসাইন আহমদীনূরী ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ই ডিসেম্বর প্রথম প্রকাশ করেন। ৮রবিউল আউয়াল ১৩০৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১২৯৩ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ আপন মাবুদের সান্নিধ্যে গমন করেন। কলিকাতা মানিকতলার দিল্লীওয়ালা গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

দেখুন:https://www.sureswardarbarsharif.net/সুফী–ফতেহ–আলী–ওয়াইসি/#১

২৬. মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ. ১৮৯২ সালে জন্ম লাভ করেন। চাচা আহমদ আলী ও ফুফু পেয়ারজান এর কাছে কুরআন মাজীদসহ অন্যান্য প্রাথমিক দ্বীনী কিতাব পড়েন। ১৯২০ হিজরীতে হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হয়ে দশ বছরে কৃতিত্বের সাথে মিশকাত সমাপ্ত করেন।একুশ বছর বয়সে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হয়ে হাদীস, দর্শন, ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। হাটহাজারি মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি যোগ দেওয়ার পর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাকে কেন্দ্র করে প্রথমবারের মতো ইফতা বিভাগের সূচনা করেন। ফতোয়াদানের ক্ষেত্রে তার গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিকত্বের কারণে সারাদেশে তিনি 'মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ' খেতাবে ভূষিত হন। শেষজীবনে হাটহাজারী মাদরাসা থেকে অবসর গ্রহণ করে নিজ গ্রাম মেখলে 'মাদরাসায়ে হামিউস সুন্নাহ' নামে ব্যতিক্রমধর্মী একটি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে তিনি দ্বীনি শিক্ষা প্রধান করেন। তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চা করতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি পান্দে ফায়েজ নামে একটি ফারসি কাব্য রচনা করেন। ফার্সি ভাষায় কবিতা লেখার পাশাপাশি আরবি ও ফারসি ভাষায় অনেক বইও লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে কান্দে খাকি, পান্দ নামায়ে খাকি, মসনভি খাকি, ফায়েজে সিতার, আল্ ফালাহ্ ফি মা ইতাআল্লাকু বিন্ নিকাহ, ফায়জুল্ কালাম লি সাইয়েদিল্ আনাম

মুহাম্মদ, আব্দুল হামীদ প্রমুখ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বঙ্গদেশে আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক বিভিন্ন জেলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে সচেষ্ট ছিলেন। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে পশ্চিম বঙ্গে যাঁরা ফারসি সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তন্মধ্যে কাজী মুহাম্মদ সাদেক খাঁ আখতার, মৌলভী রশীদুদ্দীন ওয়াহশাত ও মৌলভী আব্দুর রহীম খোরকপুরী তামান্নার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের পাশাপাশি বহু হিন্দু রাজা-মহারাজাও ফারসি সাহিত্য চর্চায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের সংস্কারক ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ফারসি ভাষায় তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন নামক একটি ধর্মীয় পুস্তিকা (১৪পৃ.) রচনা করেন (১৮০৪)। গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) ফারসি কবি শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তারের (১১৪৬-১২২১) তাযকিরাতুল আওলিয়া অবলম্বনে ছিয়ানব্বইজন আল্লাহর ওলীর জীবনী সংবলিত গ্রন্থ তাপসমালা রচনা করেন। এছাড়াও তিনি দীওয়ানে-এ-হাফেজ, গুলিস্তান, বুস্তান, কীমিয়া-এ-সাআদাত, গুলশান-এ-আসরার প্রভৃতি ফারসি গ্রন্থেরও আংশিক ভাবানুবাদ করেন।[২৭] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও (১৮১৭-১৯০৫) অনেক ফারসি শে'র (কবিতা) কণ্ঠস্থ ছিল। এমনকি তাঁকে পারস্যেও কবি হাফিযের হাফিয বলা হতো।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ফারসি ভাষা একদিকে যেমন বাংলার মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডের ভাষাতে পরিণত হয়, অপরদিকে এ ভাষা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করতে থাকে। বাংলা ভাষায় যেসকল বিদেশি শব্দ রয়েছে তন্মধ্যে ফারসির স্থান সর্বাগ্রে। এগুলো বাংলা ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "আড়াই হাজারের বেশী আরবী-ফারসী শব্দ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক বাংলায় ব্যবহার করেন।"[২৮] আদিকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাঙালি কবি-সাহিত্যিকগণও অকাতরে ফারসি শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে পুথি ও অনুবাদ সাহিত্য। এসব অনূদিত ও মৌলিক সাহিত্যে অপরিমেয় ফারসি-আরবি শব্দ ব্যবহার করে তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যকে গৌরবের আসনে সমাসীন করেছিল। মধ্যযুগের অন্নদা মঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর (১৭১৬-৬০) বলেছিলেন, 'যাবনী মিশাল'অর্থাৎ ফারসি শব্দ মিশ্রিত বাংলা না লিখলে তা রসালো হয় না। বাংলা সাহিত্যে আলাওল (১৬০৭-১৬৭৩) যে সমস্ত হাল্দ- না'ত রচনা করেন তাতে অনেক ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। শাহ মোহম্মদ সগীর ফারসি রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থের অনুকরণে রচনা করেন *ইউসুফ-জোলেখা*। *নবীবংশ, রসূল বিজয়, জঙ্গনামা* ইত্যাদি কাহিনি ফারসি গ্রন্থ অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল। বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ও তাঁর কবিতা, গল্প, পুথি সাহিত্য, নাটক ইত্যাদিতে অসংখ্য ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন।[২৯] ভাষা ও ভাবের দিক থেকে নজরুলের অনেক কবিতাকে ফারসি কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণও বলা চলে। তিনি রুবাইয়্যাত-

উল্লেখযোগ্য। ৮৬ বছর বয়সে ১৯৭৬ সনের ৭ অক্টোবরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মেখলে নিজ পারিবারিক কবরস্থানে শায়িত করা হয়।

দেখুন: ttps://bn.m.wikipedia.org/wiki/মুফতিথফয়জুল্লাহ.

২৭. *বাংলা বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড (ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৫৭), পৃ. ৩২৩।

২৮. ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ* (ঢাকা: রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭), পৃ. (ভূমিকা থেকে)।

২৯. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: কালার মাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং,বাংলা বাজার,১৯৭০), পৃ. ৮।

এ-ওমর-খৈইয়্যামের বাংলায় অনুবাদ করেন। আসলে নজরুল ছিলেন একজন ভাষাশিল্পী। এজন্য তাঁর কবিতায় তিনি অজস্র ফারসি-আরবি-উর্দু বা বিদেশি শব্দ বিশেষ দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন।[৩০] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) , এস. এ. মান্নান, এ. জলিল, সিকান্দার আবু-জাফর (১৯১৮-১৯৭৫), খালিকদাদ চৌধুরী, ড. এ, কাদের, নিজামুদ্দীন আহমদ এবং মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ যথাক্রমে হাফিয সিরাজীর দীওয়ানে হাফিয, ইকবালের আসরারে খুদী, শেখ সা'দীর (১২১০-১২৯১) গুলিস্তান-বুস্তান, ওমর খৈয়্যামের (১০৫০-১১২৩) রুবাইয়াত, মির্যা নাথানের বাহারিস্তানে গায়বী, সৈয়দ গুলাম হুসাইনের সিয়ারুল মুতাআখ্খিরীন প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ করেন। ফলে বাংলা সঙ্গীতে রুমী, হাফিযের ন্যায় সুফি-চিন্তাধারা এবং খোদা প্রেমের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। এগুলো আজও বাংলার মানুষের জীবনধারায় ফারসি সংস্কৃতির প্রভাবের প্রমাণ বহন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলন ও আধুনিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হবার ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার-প্রচারণা ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বেড়ে যায়। এ সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল ফারসি পত্রিকা। ১৮৫৭ সালের পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার নাম হলো: জাম্-এ-জাঁহানুমা (১৮২২-৪৫), আইনা-এ-সিকান্দার (১৮২৬-২৮), মিহির-এ-মুনীর (১৮৪১), দূরবীন (১৮৫৩), গুলশান-এ-নওবাহার (১৮৫৪-৫৭) ইত্যাদি।[৩১] এসব পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গদেশের ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনাবলী জনসমক্ষে আনতে সক্ষম হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ফারসি চর্চা ব্যহত হয়নি। বরং এ সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণ ও প্রচারণার ফলে এ ভাষার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে উঠে। এস. এম. ইকরাম এ প্রসংগে বলেন-

"More persian books written in Bengal during nineteenth century are available than have come down to us from the previous six hundred year's."[৩২]

মুসলিম শাসনামলের ন্যায় ব্রিটিশ রাজত্বকালেও মাদরাসাই ছিল ফারসিচর্চার প্রধান উৎস কেন্দ্র। ১৮৭৪ সালে একাধারে ঢাকা মুহসিনিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদরাসা ও রাজশাহী মুহসিনিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি উদ্যোগে ফারসি-আরবিচর্চা অব্যাহত থাকে এবং ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং খোলা হয়। ছাত্রদের স্কলারশিপ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। নয়টি জেলা স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়।[৩৩] এছাড়াও বে-সরকারি ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কওমি মাদরাসাগুলো মূলত ফারসির মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এসব মাদরাসাসমূহে ফারসি সাহিত্যের পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণসহ হানাফি ফিকেহর বহু পাঠ্যপুস্তক ফারসি ভাষায় পড়ানো হয়। বিশেষত, শেখ সা'দীর গুলিস্তান, বুস্তান, কারীমা, শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের পান্দনামা, দীওয়ানে হাফিয ও মাসনাভী পাঠ্যপুস্তক হিসেবে আজও পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফারসি চর্চা :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর বাংলাদেশ-ইরান সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ইরানের বিপ্লবী সরকার ইসলামি বিপ্লবের পাশাপাশি বিশ্বময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার ও

৩০. আব্দুস সাত্তার, *নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২), পৃ. ১৩।

৩১. *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*,পৃ. ৫৮।

৩২. তদেব,পৃ. ৫৯।

৩৩ কাজী আব্দুল মান্নান *আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ১ম খন্ড (রাজশাহী: বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১), পৃ. ৫৭।

প্রসারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ইরানি দূতাবাসের অধিনে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠান ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচার-প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। নিয়মিত ফারসি ভাষা কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নানা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। ইরানে ফারসি ভাষার বিভিন্ন মেয়াদী কোর্সে ফারসি শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী প্রেরণ করে। যদিও প্রথমদিকে ফারসি ভাষার চর্চা কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকাস্থ ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় সফলভাবে ফারসি বিভাগ, ফারসি ভাষা কোর্স চালু হওয়ার কারণে বাংলাদেশে ফারসি চর্চার ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। উল্লেখ্য যে, ফারসি চর্চাকে এ দেশে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে তৎকালীন ইরানি প্রেসিডেন্ট জনাব হাশেমী রাফসানজানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে "বাংলাদেশ-ইরান সেন্টার ফর পার্সিয়ান স্টাডিজ"ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ইরান সরকার কেবল বাংলা ভূখন্ডে ফারসি চর্চার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারেরই সচেষ্ট হননি, বরং এদেশ ও জাতির জ্ঞান রাজ্যের সমৃদ্ধায়নে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উপসংহার

আলোচনার উপান্তে বলা যেতে পারে যে, ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুকূল পরিবেশের সুযোগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য স্বাধীনভাবে বিকশিত ও বিস্তৃত হবার সুযোগ লাভ করে। এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা এদেশের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়। এ ভাষা একসময় আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। ইরানি কবি ও লেখকদের মূল্যবান লেখা এ উপমহাদেশের মানুষদেরকে আপ্লুত করেছে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা বাংলার মানুষের রক্তকণিকায় মিশে আছে। অতীতে ফারসি ভাষার পরিধির বিস্তার ও প্রভাবের কারণে এদেশের জনগণের ভাষা বাংলা সে সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যাতিক্রমী ও চমকপ্রদ সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করে। যার ফলে ফারসি ভাষা আজও বাংলার জ্ঞানী-গুনীদের মাঝে বিশেষ সমর্যাদার আসনে সমাসীন হয়ে রয়েছে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে মহীরুহে পরিনত হয়েছে।

গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে,

- যে কোন ভাষার উত্থান–পতন, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক।
- ছয়শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষদের কীর্তিমালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে ফারসি ভাষার শিক্ষা অপরিহার্য।
- ইসলামী জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার ফারসি ভাষায় বিদ্যমান বিধায় এ জ্ঞান আহরনে জ্ঞান পিপাসুদের ফারসি ভাষায় পান্ডিত্যার্জন আবশ্যক।
- ছয়শত বছরের আদালত পাড়ার নথিপত্র গবেষণায় ফারসি ভাষায় দক্ষতার্জনের কোন বিকল্প নেই।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণ ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যকর্ম উপলব্ধিতে ফারসি ভাষা পঠন–পাঠন জরুরী।

গ্রন্থপঞ্জি:

[১] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)।

[২] ড. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)।

[৩] M.A. Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* V-11 (Karachi: Pakistan Historical Society, 1963).

[৪] মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮)।

[৫] বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা, ৬ষ্ঠ খন্ড (ভাষা সাহিত্য), সম্পাদনা: আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭)।

[৬] ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ২য় খন্ড, অনুবাদ: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২)।

[৭] বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬)।

[৮] ড. কলীম সাহসারামী, *খেদমাত গুযারানে ফারসী দার বাংলাদেশ* (ঢাকা: রায়েযানি ফারহাঙ্গে জামহুরী ইসলামী ইরান, ১৯৯৯)।

[৯] খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিজ শিরাযী, মুহাম্মদ কাযবীনী ও ড. কাসেম গনী সম্পা., *দীওয়ান* (তেহরান: কিতাব খানেয়ে মিল্লী ইরান, ১৩৮৩ হি.)।

[১০] গোলাম হুসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: শ্রীরামগুপ্ত (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৫)।

[১১] খেদমাত গুযারানে ফারসী দার বাংলাদেশ।

[১২] Sir Jadunath Sarkar (ed.), *History of Bengal,* V. II, (Dacca : Dacca University, 2006).

[১৩] Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and his times* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1963).

[১৪] শিবলী নু'মানী, *মাকালাত—এ—শিবলী*, ৩য় খন্ড (আযমগড়, মা'আরিফ প্রেস ১৯৩২)।

[১৫] ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *পশ্চীম বংগে ফার্সী সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৯৪)।

[১৬] *বাংলা বিশ্বকোষ*, ২য় খন্ড (ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৫৭)।

[১৭] ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *বাংলা সাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ* (ঢাকা:রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭)।

[১৮] শাহাবুদ্দীন আহমদ, *শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: কালার মাস্টার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, বাংলা বাজার, ১৯৭০)।

[১৯] আব্দুস সাত্তার, *নজরুল কাব্যে আরবী—ফারসী শব্দ* (ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯২)।

[২০] কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ১ম খন্ড (রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১)।